যাকাত প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মো. আশরাফুল ইসলাম*

[Islam is a fair, beautiful and balanced way of life. The system of life in which clear directions are described about the overall affairs of the people. And the economic aspect is very important in all matters. For this reason, the issues related to economy have been discussed in detail in the Complete Guide to Life in Islam. The Zakat system is an important branch of Islamic economics. The main feature of this law is to regularly collect a certain portion of the wealth from the rich and well-off people and distribute it among eight classes of people including the poor and deprived. This provision has been described as the third pillar of Islam as Zakat is the main tool for building a society free from discrimination and poverty. The Zakat system was introduced to protect the poor class from the economic exploitation and oppression of the rich and wealthy and to get their due rights. Although there is no difference of opinion regarding the obligatory nature of Zakat, there is disagreement among the scholars as to when and where it was made obligatory. Zakat was introduced in Mecca during the early period of Islam but no detailed regulations were introduced at that time. Later, after the Hijrah, the law of Zakat was introduced and implemented in Madinah and the nisab, amount, conditions and areas of expenditure of Zakat were described in detail. The discussion article highlights the brief introduction of Zakat, the period of introduction of Zakat, the context of introduction of Zakat and the necessity of introduction of Zakat to achieve economic prosperity.]

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাগীব-রাবেয়া ডিগ্রি কলেজ, সিলেট

ভূমিকা

ইসলাম একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। যে জীবন ব্যবস্থায় মানুষের সার্বিক বিষয়াদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে। আর সার্বিক বিষয়াদির মধ্যে অর্থনৈতিক দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামে অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থা। সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উদ্বৃত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ দরিদ্র ও বঞ্চিতসহ আট শ্রেণির লোকদের মধ্যে যথাযথ বণ্টন করাই এ বিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যাকাত বৈষম্য ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের প্রধান উপাদান বিধায় এ বিধানকে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ বা রুকন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সালাতের পরই এর স্থান। যাকাতের বিধান ফরযের ব্যাপারে কোনো মতভেদ না থাকলেও এ বিধান কখন এবং কোথায় ফরয হয়েছিল সে ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান। আলোচ্য প্রবন্ধে যাকাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখপূর্বক যাকাত প্রবর্তনের সময়কাল, প্রেক্ষাপট এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে তা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় সম্পাদিত হয়েছে। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য ভাষার তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রবন্ধটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গুণাত্মক, বর্ণনামূলক, ঐতিহাসিক এবং বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। আর এসকল পদ্ধতির আলোকে অত্র প্রবন্ধ রচনায় প্রাথমিক ও গৌণ উৎসের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। অপরদিকে সংগৃহীত তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংযোজনের ক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতির স্বীকৃত নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ প্রণয়নে যে সকল তথ্যের উপর নির্ভর করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- আল-কুরআনে বর্ণিত যাকাত সম্পর্কিত আয়াত।
- হাদিসের বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত যাকাত সম্পর্কিত হাদিস।
- যাকাত সম্পর্কিত মৌলিক গ্রন্থাবলি।
- শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বিশ্লেষণের জন্য বাংলা, আরবি ও ইংরেজি ভাষার মৌলিক অভিধান।

আলোচ্য প্রবন্ধে স্বীকৃত পদ্ধতি অনুযায়ী ফুটনোটে টীকা ও তথ্য সংযোজন করা হয়েছে এবং খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের জন্ম ও মৃত্যু সন সংযোজন করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশে যাকাত সম্পর্কে কতিপয় গবেষণাকর্ম ও প্রকাশিত গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর হয়। তন্মধ্যে মোহাম্মদ আব্দুল মুকিমের *বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা*, মীর মোঃ আনোয়ার হোসেনের *দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা : নওগাঁ জেলার পোরশা ও সাপাহার অঞ্চলের উপর একটি সমীক্ষা*, মুহাম্মদ আব্দুস সালাম মিঞার *মানাহিজুয যাকাতি ওয়া আছারুহা ফী তানমিয়াতিল মুজতামা'ই*, মাহমুদ জামালের *দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ও উশর : চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলোকে একটি সমীক্ষা*, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম কর্তৃক অনূদিত আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভীর *ইসলামের যাকাত বিধান (১ম ও ২য় খণ্ড)*, ড. মাহফুজুর রহমান কর্তৃক অনূদিত আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভীর *ইসলামে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে যাকাতের ভূমিকা*, হুমায়ুন খান কর্তৃক অনূদিত ফারিশতা জ.দ. যায়াসের *যাকাতের আইন ও দর্শন*, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীমের *যাকাত*, জাবেদ মুহাম্মাদের *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত*, অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইনের *যাকাত কি ও কেন*, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত গুরুত্ব ও প্রয়োগ*, প্রফেসর ড. আ.ছ.ম. তরীকুল ইসলামের *অর্থনৈতিক সফলতার আসমানী বিধান : যাকাত ও উশর*, এ জি এম বদরুদ্দোজার *যাকাতের ব্যবহারিক বিধান*, মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী ও মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমীর *আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের বিধান*, ড. মুহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহর *যাকাত দারিদ্র বিমোচনই নয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি*, মুহাম্মদ ইকবাল কিলানীর *কিতাবুয্-যাকাত*, আমিনুল ইসলামের *পূর্ণাঙ্গ নামায ও যাকাতের বিধান*, আবদুস শহীদ নাসিমের *যাকাত সাওম ই'তেকাফ*, ইকবাল হুসাইন মাসুমের *দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসকল গবেষণাকর্ম ও গ্রন্থে যাকাতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও এতে প্রাসঙ্গিকভাবে যাকাত প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক উল্লেখযোগ্য কোনো আলোচনা তেমন পরিলক্ষিত হয় না। তাই বলা যায় যে, "যাকাত প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ" শিরোনামে বাংলাদেশে অদ্যাবধি কোনো গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়নি। তাই আলোচ্য প্রবন্ধের আলোচনা যাকাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, যাকাত প্রবর্তনের সময়কাল, প্রেক্ষাপট এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে তা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়কে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে।

যাকাতের পরিচয়

যাকাত (زَكَاة) শব্দটি আরবি। এটি একবচন, বহুবচনে زَكَوَاتٌ।[১] আভিধানিক অর্থে যাকাত (زَكَاة) শব্দটি পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতা, প্রাচুর্য, বৃদ্ধি, বরকত, বর্ধিত হওয়া, অতিরিক্ত, প্রশংসা, সংশোধন প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ, purification,[৩] purity, honesty, justification,[৪] grow, increase ইত্যাদি। আল-কুরআনে যাকাত (زَكَاة) শব্দটি পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾

"যে ব্যক্তি পবিত্রতা অবলম্বন করেছে সেই সফলকাম হয়েছে।"[৫]

আল-কুরআন ও আল-হাদিসে যাকাত শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে সাদাকা (صَدَقَةٌ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[৬] صَدَقَةٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে صَدَقَاتٌ। শব্দটির একবচনের রূপ ব্যবহার করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾

"আপনি ধনীদের সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহ করুন।"[৭]

অন্যত্র বহুবচনের রূপ ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾

"তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা সাদাকা বণ্টনে আপনাকে দোষারূপ করে।"[৮]

পরিভাষায়, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে খুশি করার নিমিত্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদ হাশেমি ও তাদের দাস-দাসী ব্যতিত নির্দিষ্ট শ্রেণির (আট শ্রেণির) হকদারকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়।[৯]

বদরুদ্দীন আল-আয়নী (রহ.) (মৃ. ৮৫৫ হি.) বলেন,

هُوَ إِيتَاء جُزْء من النّصاب الشَّرْعِيّ الْحَوْلي إِلَى فَقير مُسْلِم غَيْر هَاشِمي وَلَا مَوْلَاهُ بِشَرْط قطع الْمَنْفَعَة عَن الْمُزَكي لله تَعَالَى

"যাকাত হলো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাকাত গ্রহীতার পক্ষ থেকে কোনো প্রকার উপকার না পাওয়ার শর্তে হাশিমি বংশ ও তাঁদের আযাদকৃত দাস-দাসী ব্যতিত কোনো দরিদ্র মুসলিমকে এক বছর পূর্ণ হওয়া শারী'আত কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ থেকে অংশ বিশেষ (২.৫%) প্রদান করা।"[১০]

আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-জুযায়রী (রহ.) (১২৯৯-১৩৬০ হি.) বলেন,

تَمْلِيْكُ مَالٍ مَخْصُوْص لِمُسْتَحَقّه بَشَرَائِطٍ مَخْصُوْصَة، وَهَذَا مَعْنَاهُ: أَنَّ الَّذِيْنَ يمْلِكُوْنَ نِصَاب الزَّكَاةِ يفْتَرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْطُوْا الْفُقَرَاء وَمَنْ عَلَى شَاكِلَتِهِمْ مَنْ مُسْتَحَقِّي الزَّكَاة الْآتِيْ بَيَانهم قَدْراً مَعِيْناً مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِطَرِيْقِ التَّمْلِيْكِ

“উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে বিশেষ মালের মালিক বানিয়ে দেয়া। অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকবর্গের উপর ফরয হলো যাকাত গ্রহণের যোগ্য ফকির ও অন্যদের নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল (মালিক বানানোর পদ্ধতি) দেয়া।”[১১]

ইউসুফ আল-কারযাভী (রহ.) (১৯২৬-২০২২ খ্রি.) বলেন,

وَالزَّكَاةُ فِي الشَّرْعِ : تَطْلُقُ عَلَى الْحِصَّةِ الْمُقَدَّرَةِ مِنَ الْمَالِ الَّتِيْ فَرَضَهَا الله الْمُسْتَحقِّيْن. كَمَا تَطْلُقُ عَلَي نَفْسِهِ إِخْرَاجِ هَذِهِ الْحِصَّةِ

“শারী‘আতের দৃষ্টিতে যাকাত শব্দটি মানুষের ধন-সম্পদে আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক ফরযকৃত সুনির্দিষ্ট অংশ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদেরকে ঐ ফরযকৃত সুনির্দিষ্ট অংশ প্রদান করাকেও যাকাত বলে।”[১২]

যাকাতের বিধান ইসলামি শারী‘আতের মূল চারটি উৎস তথা কুরআন, হাদিস, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

“আর তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে যারা অবনত হয়।”[১৩]

যাকাত প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যাকাত। নামাযের পরই এর স্থান। আল-কুরআনে নামায কায়েমের নির্দেশের পাশাপাশি যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে অর্থাৎ মক্কায় নামাযের বিধান ফরয করা হলেও যাকাতের বিধান কখন ফরয হয়েছে তা নিয়ে আলিমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। দারিদ্র দূরীকরণে অত্যন্ত কার্যকর এ ব্যবস্থাটি শুধু হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর শারী‘আতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, বরং পূর্ববর্তী বিভিন্ন নবি-রাসূলের যুগেও কার্যকর ছিল। তবে সে সময় যাকাতের বিধান ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরবর্তীতে জাহিলি যুগে ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ বিধানটি সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে যায়।

পূর্ববর্তী নবি-রাসূলগণের যুগে যাকাত

পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থসমূহে দরিদ্র ও দুর্বল লোকদের কল্যাণের জন্য যে দাওয়াতের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তা ছিল অধিকতর বলিষ্ঠ ও গভীর প্রভাবশালী। মানবীয় বিভিন্ন দর্শনের তুলনায় সে সবের অবদান ছিল বহুগুণে বেশি। মানবরচিত ধর্মমত বা বৈষয়িক ধর্মবিশ্বাস অনুরূপ অবদান রাখতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ছিল। সমাজ থেকে দারিদ্র নির্মূলে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ তথা কুরআন মাজিদে ‘যাকাত’ নামক যে বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, পূর্ববর্তী কোনো নবি-রাসূলের দাওয়াত এ মানবিক দিকের প্রতি গুরুত্বারোপ না করে পারেনি। নিম্নে আল-কুরআনের আলোকে পূর্ববর্তী নবি-রাসূলগণের যুগে যাকাতের বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

ক. ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া‘কূব (আ.)

ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া‘কূব (আ.)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (٧١) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (٧٢) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾

“আর আমি তাঁকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌঁছে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্যে কল্যাণ রেখেছি। আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও পুরস্কার স্বরূপ দিলাম ইয়া‘কূব এবং প্রত্যেককেই সৎকর্মপরায়ণ করলাম। আর আমি তাদেরকে নেতা করলাম। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাদের প্রতি ওহি অবতীর্ণ করলাম সৎকর্ম করার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত প্রদান করার। তারা আমার ইবাদতে ব্যাপৃত ছিল।”[১৪]

খ. ইসমা‘ঈল (আ.)

ইসমা‘ঈল (আ.)-এর প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (٥٤) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾

“আর কিতাবে স্মরণ করো ইসমা‘ঈলের কথা। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতিতে সত্যপরায়ণ, আর তিনি ছিলেন একজন রাসূল, একজন নবি। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন।”[১৫]

গ. মূসা (আ.)

মূসা (আ.) তাঁর নিজের সম্পর্কে দোয়া করে বলেছিলেন, “হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে পৃথিবী ও পরকালে কল্যাণ দান করো।” এর প্রতিউত্তরে আল্লাহ্

তা'আলা যাকাত দানের বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾

"আর পৃথিবীতে এবং পরকালে আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দাও। আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) বললেন, আমার শাস্তি– তা দিয়ে আমি আঘাত হানব যাকে ইচ্ছা করব, কিন্তু আমার করুণা– তা সবকিছুই পরিবেষ্টন করে। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব যারা ভয় রাখে, যাকাত প্রদান করে এবং আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।"[১৬]

মূসা (আ.)-এর উম্মত তথা বনি ইসরাঈল থেকে আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল বিষয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন তার মধ্যে যাকাত প্রদানের প্রতিশ্রুতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾

"যখন আমি বনি ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।"[১৭]

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

"আল্লাহ্ বনি ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারো জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ্ বলে দিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দিতে থাক, আমার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁদের সাহায্য কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাক। তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহ দূর করে দিব এবং অবশ্যই

তোমাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করব, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাফির হয়, সে নিশ্চয়ই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।"[১৮]

ঘ. ঈসা (আ.)

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পূর্বে ঈসা (আ.)-ই ছিলেন সর্বশেষ নবি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকেও যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। যেমন দোলনায় থাকাবস্থায় ঈসা (আ.) বলেছিলেন,

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾

"আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে।"[১৯]

ঙ. আহলুল-কিতাব

সাধারণ আহলুল-কিতাব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

"তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ প্রদান করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। আর এটাই সঠিক ধর্ম।"[২০] উপর্যুক্ত আয়াত থেকে যে বিষয়সমূহ প্রতীয়মান হয় তা হলো:

- পূর্ববর্তী নবি-রাসূলগণের যুগে দরিদ্রদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। স্বার্থপরতা ও কার্পণ্যের পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখানো হয়েছে এবং ব্যক্তিগত ও স্বেচ্ছায় দান করার জন্য বলিষ্ঠ আহবান উপস্থাপন করা হয়েছে।
- তবে এগুলো যাকাতকে কর্তব্য ও বাধ্যতামূলক করার দিক দিয়ে উচ্চতর মানে উন্নীত হতে পারেনি। এসব কাজ না করলেও দীনের কোনো মৌলিক কাজ ত্যাগ করা হয়েছে বলে এসব কথা দ্বারা অনুভূতি জেগে উঠে না এবং ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করবেন, সে কথাও তা থেকে জানা যায় না।
- এ কাজকে ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তাদের উপর এ কাজ করানোর জন্য রাষ্ট্রকে কোনো কর্তৃত্ব দেয়া হয়নি।

- সাদাকা ও দান করার কাজ কর্তব্য হওয়ার জন্য সম্পদের কোনো পরিমাণ নির্ধারণ এবং কোনোরূপ শর্তও আরোপ করা হয়নি। ফলে রাষ্ট্র তা আদায় করে নেয়ার কোনো দায়িত্ব বুঝতে পারে না।
- দরিদ্রদের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, দারিদ্র সমস্যার সমাধান তার লক্ষ্য নয়। দারিদ্রকে মালিকদের মুখাপেক্ষী করে দেয়ারও কোনো ইচ্ছা নেই, বরং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু তাদের দুরবস্থার মাত্রা হ্রাস করা এবং তাদের অভিযোগের ধ্বনিকে ক্ষীণ করা।[২১]

সুতরাং বলা যায় যে, দরিদ্র ও দুর্বল লোকেরা সক্ষম ধনী শ্রেণি লোকদের দয়া ও অনুগ্রহের অধীন বেঁচে থাকত। যখন তাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রেম, পরকালের ভয় জাগত এবং জনগণের কাছ থেকে প্রশংসা ও খ্যাতি লাভের ইচ্ছা জাগত, ঠিক তখনই তারা কিছু দান করত। কিন্তু তারা যখন ধনপ্রেম ও স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়ে যেত, তখন দরিদ্রদের ছটফট করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া ছাড়া কোনো পরিণতি হতো না। কেননা তাদের কোনো অধিকার স্বীকৃত ও সুপরিজ্ঞাত ছিল না।

জাহিলি যুগে যাকাত

গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু সম্পর্কে জাহিলি যুগে একটি অপরিপক্ব ও পক্ষপাতদুষ্ট নিয়ম প্রচলিত ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

"আল্লাহ্ যেসব শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশ আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করে অতঃপর নিজ ধারণা অনুসারে বলে, এটা আল্লাহ্র এবং এটা আমাদের অংশীদারদের। অতঃপর যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো আল্লাহ্র দিকে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহ্র তা তাদের উপাস্যদের দিকে পৌঁছে যায়। তাদের বিচার কতই না মন্দ।"[২২]

উক্ত আয়াত দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, জাহিলি যুগের মুশরিকরা তাদের কৃষি উৎপাদন এবং গৃহপালিত পশুর একটি অংশ তাদের প্রভুর জন্য নির্দিষ্ট করে রাখত এবং তা দরিদ্র ও অসহায়দের মধ্যে বণ্টন করে দিত। তারা আরেকটি অংশ বুতখানার মুতাওয়াল্লীদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখত। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, শুধু বুতের (মূর্তির) জন্য রাখা অংশটির প্রতিই তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত এবং খোদার জন্য রাখা অংশটির অবস্থা এরূপ হতো যে, এর কিছু অংশ বুতখানার

মুতাওয়াল্লীরাই খেয়ে ফেলত। বিভিন্ন কারণে উপরিউক্ত অবস্থাটি এতটাই কদর্য হয়ে পড়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা এর পরিবর্তে নতুনভাবে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।[২৩]

যাকাত প্রবর্তনের সময়কাল

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যাকাত। নামাযের পরই এর স্থান। তবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে অর্থাৎ মক্কায় নামাযের বিধান ফরয করা হলেও যাকাতের বিধান কখন এবং কেন ফরয হয়েছে তা নিয়ে আলিমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত করা হলো:

ক. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَلَمَّا صَدَّقَ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ زَادَهُمُ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا صَدَّقُوا بِهَا زَادَهُمُ الزَّكَاةَ، فَلَمَّا صَدَّقُوا بِهَا زَادَهُمُ الصِّيَامَ، فَلَمَّا صَدَّقُوا بِهِ زَادَهُمُ الْحَجَّ، فَلَمَّا صَدَّقُوا بِهِ زَادَهُمُ الْجِهَادَ، ثُمَّ أَكْمَلَ لَهُمْ دِينَهُمْ فَقَالَ تَعَالَى:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবিকে পাঠিয়েছেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালিমার সাক্ষ্যসহ। লোকেরা যখন তা গ্রহণ করে নিল তখন তাদের জন্য নামায ফরয করা হলো। তাও যখন তারা পালন করতে লাগল তখন যাকাত ফরয করা হলো। তাকে যখন তারা সত্যরূপে গ্রহণ করে নিল তখন তাদের উপর রোযা ফরয করা হলো। তা মেনে নেয়ার পর হজ্জ ফরয করা হলো। তারপর ফরয করা হলো জিহাদ। অতঃপর তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম (সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৩)।"[২৪]

খ. ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (রহ.) (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন, অধিকাংশ আলিম রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হিজরতের পর যাকাত ফরয হয়েছে বলে মত পোষণ করেছেন। তবে তাঁদের মধ্যে কেউই সুনিশ্চিতভাবে দৃঢ়তার সাথে নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করেননি।[২৫]

গ. ইমাম নববী (রহ.) (৬৩১-৬৭৬ হি.) তাঁর 'রওযা' গ্রন্থের 'সিয়ার' অধ্যায়ে ইঙ্গিত করেছেন যে, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় হিজরিতে

যাকাতের বিধান প্রবর্তিত হয়।[২৬] ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (রহ.) তাঁর এ উক্তিটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি সুনানুন্-নাসাঈ এবং সুনানু ইব্ন মাজাহতে বর্ণিত হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, কায়স ইব্ন সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ

"যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে সাদাকাতুল-ফিত্র আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর যখন যাকাতের হুকুম অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি আমাদের আদেশও করলেন না এবং নিষেধও করলেন না। সুতরাং আমরা তা দিতেই থাকলাম।"[২৭] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের পূর্বে সাদাকাতুল-ফিত্র ওয়াজিব হয়েছিল। আরও প্রমাণিত হয় যে, রমযানের রোযাও যাকাতের পূর্বে ফরয হয়েছিল। কেননা সাদাকাতুল-ফিত্রের সম্পর্ক রোযার সাথেই হয়ে থাকে।

ঘ. ঐতিহাসিক ইব্নুল আছীর (রহ.) (মৃ. ৬০৬ হি.) তাঁর 'আত্-তারীখ' গ্রন্থে নবম হিজরিতে যাকাতের বিধান প্রবর্তিত হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে মত ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু এ উক্তির ব্যাপারেও মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন আবূ সুফিয়ান (রা.) সপ্তম হিজরির প্রারম্ভে বাদশাহ হিরাকলের সাথে কথোপকথনের সময় বলেছিলেন, يَأْمُرُنَا بِالزَّكَاةِ "তিনি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদেরকে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে থাকেন।"[২৮] আবার অনেকেই ইব্নুল আছীরের (রহ.) মতকেই প্রাধান্য দিয়ে বলেন, ছা'লাবাহ ইব্ন হাতিবের ঘটনায় যা সংঘটিত হয়েছিল তা হলো, সাদাকার আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাদাকা আদায়কারী প্রেরণ করে বললেন, 'এটা জিযিয়া ছাড়া কিছুই নয়, এটা জিযিয়ার সহোদরা।'[২৯] আর জিযিয়া ওয়াজিব হয় নবম হিজরিতে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যাকাতও নবম হিজরিতে ফরয হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, হাদিসটি দুর্বল। সুতরাং তা দলিল হিসেবে ধর্তব্য নয়।[৩০]

ঙ. ইব্ন খুযায়মাহ (রহ.) তাঁর সহিহ গ্রন্থে মত ব্যক্ত করেছেন যে, হিজরতের পূর্বে যাকাত ফরয হয়। তিনি উম্মু সালামাহ (রা.)-এর হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, তাঁরা যখন হাবশাতে হিজরত করেন তখন তাঁদের মধ্যে জা'ফর ইব্ন আবী তালিব (রা.)ও ছিলেন। তিনি বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট

নবি করিম (সা.) সম্পর্কেও বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি তাদের কী কী শিক্ষা দিয়েছেন, সেই পর্যায়ে বলতে গিয়ে বলেন,

يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ

"তিনি আমাদের নামায পড়া, যাকাত দেয়া ও রোযা রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকেন।" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হিজরতের পূর্বে যাকাত ফরয হয়েছে।[৩১]

চ. ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (রহ.) আরও বলেন, যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারটি ঘটে নবম হিজরির পূর্বে। যিমাম ইব্ন ছা'লাবা (রা.) সংক্রান্ত একটি হাদিস আনাস (রা.) হতে সহীহুল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। তিনি নবী করিম (সা.)-এর নিকট এসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন এবং নবী করীম (সা.) সে সকল প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন, তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল,

قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ

"তিনি বলেন, আমি আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ই কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের (সম্পদ) থেকে এসব সাদাকা (যাকাত) আদায় করে গরিবদের মধ্যে ভাগ করে দিতে? নবি করিম (সা.) বললেন, আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ।"[৩২] উক্ত যিমাম ইব্ন ছা'লাবা (রা.) পঞ্চম হিজরিতে যখন মদিনায় নবি করিম (সা.)-এর নিকট এসেছিলেন তখন এ প্রশ্নোত্তর হয়েছিল। তবে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী প্রেরণের ব্যাপারটি নবম হিজরিতেই সংঘটিত হয়েছিল। তাহলে তার পূর্বেই যাকাত ফরয হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে।[৩৩] সুতরাং বলা যায় যে, যাকাত আদায় ও বিতরণের ব্যবস্থাপনার বিধান দ্বিতীয় হিজরির পর ও পঞ্চম হিজরির পূর্বে কোনো এক সময়ে অবতীর্ণ হয়।

ছ. আবূ জা'ফর আত্-তাবারী (রহ.) (২২৪-৩১০ হি.) বলেন, দ্বিতীয় হিজরিতে যাকাত ফরয হয়।[৩৪]

জ. আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী (রহ.) (১০২৫-১০৮৮ হি.) বলেন, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় হিজরিতে যাকাত ফরয হয়।[৩৫]

ঝ. আব্দুল হক মুহাদ্দিস দিহলবী (রহ.) (৯৫৯-১০৫২ হি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হিজরতের পর দ্বিতীয় হিজরির রমযানের পূর্বে অথবা পরে যাকাতের বিধান প্রবর্তিত হয়।[৩৬]

ঞ. আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-জুযায়রী (রহ.) বলেন, দ্বিতীয় হিজরিতে যাকাতের বিধান ফরয হয়।[৩৭]

ট. ড. ওয়াহবাহ ইব্‌ন মুস্তাফা আয্-যুহায়লী (১৯৩২-২০১৫ খ্রি.) বলেন, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে মদিনায় যাকাতের বিধান ফরয হয়।[৩৮]

ট. ইব্‌ন আকীল (রহ.) আল-ওয়াদিহ গ্রন্থে লিখেছেন, রোযা ফরয হওয়ার পর যাকাত ফরয হয়।[৩৯]

যাকাত সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, মতামত এবং গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করলে অনুধাবন করা যায় যে, যাকাতের বিধান ফরয হওয়ার সময়ের ব্যাপারে বর্ণিত মতামতসমূহ দু'টি ভাগে বিভক্ত। একদলের মতে, যাকাত ফরয হয়েছে হিজরতের পূর্বে এবং অন্যদলের মতে, যাকাত ফরয হয়েছে হিজরতের পরে। উপর্যুক্ত দু'টি মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে আলিমগণ কতিপয় মত প্রদান করেছেন। নিম্নে সে সকল মতের মধ্যকার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

ক. ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী (রহ.) বলেন, হিজরতের দ্বিতীয় বছরে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বেই যাকাত ফরয হয়েছে। সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা.) বর্ণিত হাদিস থেকেও তাই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ثُمَّ نَزَلَتْ فَرِيضَةُ الزَّكَاةِ

"যাকাত সংক্রান্ত হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূল (সা.) আমাদেরকে 'সাদাকাতুল-ফিতর' দেয়ার জন্য আদেশ করেছিলেন। অতঃপর যাকাত ফরয হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হয়।"[৪০] ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী (রহ.) বলেন, এ হাদিসটির সনদ সহিহ। তা প্রমাণ করে যে, 'সাদাকাতুল-ফিতর' ফরয হয়েছে যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে। কাজেই তা রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পরেই হয়ে থাকবে। আর বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, রমযানের রোযা ফরয হয়েছিল হিজরতের পর। কেননা যে আয়াত এ ফরয ঘোষণা করেছে, তা সর্বসম্মতভাবেই মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে।[৪১]

খ. ইব্‌ন কাছীর (রহ.) (৭০০-৭৭৪ হি.) সূরা আল-মু'মিনুনের তাফসিরে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ "যারা যাকাত দান করে থাকে।"[৪২] অর্থাৎ মুমিনগণের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা তাদের মালের যাকাত আদায় করে থাকে। অধিকাংশ তাফসিরবিদ এরূপ অর্থ করেছেন। কিন্তু এতে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এটি তো মাক্কি আয়াত, অথচ যাকাত তো ফরয হয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছরে। সুতরাং

মাক্কি আয়াতে যাকাতের বর্ণনা কীভাবে এল? এর উত্তর হলো এই যে, যাকাত মক্কাতেই ফরয হয়েছিল, তবে যাকাতের নিসাবের পরিমাণ প্রভৃতি হুকুম মদিনায় নির্ধারিত হয়েছিল। যেমন দেখা যায়, সূরা আল-আন'আমও তো মাক্কি সূরা, অথচ সেখানেও যাকাতের এই হুকুমই বিদ্যমান রয়েছে। বলা হয়েছে,

﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾

"(বৃক্ষ) যখন ফলন্ত হয় তখন এগুলোর ফল খাও এবং কর্তনের সময় হক দান করো।"[৪৩] সূরা আল-মু'মিনূনের ৪ নং আয়াতের আবার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, নফসকে তারা শিরক এবং কুফরির ময়লা আবর্জনা থেকে পবিত্র করে থাকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾

"যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়।"[৪৪]

আবার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, নফসেরও যাকাত এবং মালেরও যাকাত। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা।[৪৫]

গ. সায়্যিদ সাবিক (রহ.) (১৩৩৫-১৪২০ হি.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কায় যাকাত অনির্দিষ্টভাবে ফরয ছিল। কী পরিমাণ সম্পদে এবং কতটুকু দেয়া ফরয, তা নির্ধারিত ছিল না। মুসলিমগণের সচেতনতা ও সহানুভূতির উপরই এটি ন্যস্ত ছিল। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণির সম্পদের যাকাতের পরিমাণ নির্ধারিত হয় দ্বিতীয় হিজরিতে। তখনই বিস্তারিতভাবে যাকাতের বিধান প্রবর্তিত হয়।[৪৬]

ঘ. ইউসুফ আল-কারযাভী (রহ.) বলেন, ইসলামি আইন রচনার ইতিহাসে সর্বজনজ্ঞাত কথা হচ্ছে, যাকাত মদিনায় ফরয হয়েছে। তাহলে কুরআনের মাক্কি সূরার আয়াত বা সূরাসমূহে যাকাতের উল্লেখ কী করে সাযুজ্যপূর্ণ হতে পারে? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, মাক্কি সূরাসমূহে যে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে, তা হুবহু সেই যাকাত নয়, যা পরবর্তীতে মদিনায় বিধিবদ্ধ হয়েছে এবং তার পরিমাণ ও নিসাব নির্ধারিত হয়েছে। তা সংগ্রহ ও আদায় করার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছে। তার সংগঠন করার জন্য রাষ্ট্র সরকার দায়িত্বশীল হয়েছে। মক্কায় যাকাত ছিল নিঃশর্ত, নিসাব ও পরিমাণ অনির্ধারিত। আর তা আদায় করা ব্যক্তিদের ঈমান ও তাদের মুমিন ভাইদের প্রতি ভ্রাতৃত্বের কর্তব্যবোধের উপর ছিল ন্যস্ত। তখন ধন-মাল থেকে কিছু একটা পরিমাণ দিয়ে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। যদিও অভাব আরও অধিক ব্যয় করার দাবি করছিল।[৪৭]

কুরআন মাজিদে ‘যাকাত’ ফরয ঘোষিত হয়েছে। আর সুন্নাত তারই তাকিদ করছে বলিষ্ঠ কণ্ঠে এবং তা মাক্কি জীবন থেকেই। জা‘ফর ইব্‌ন আবি তালিব (রা.) হাবশায় হিজরতকারী মুসলিমগণের পক্ষ থেকে হাবশার সম্রাট নাজ্জাশীর সাথে কথা বলেছেন, তাঁর নিকট নবি করিম (সা.) সম্পর্কেও বর্ণনা প্রদান করেছেন, তিনি তাদের কী কী শিক্ষা দিয়েছেন, সেই পর্যায়ে বলতে গিয়ে বলেছেন,

يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ

“তিনি আমাদের নামায পড়া, যাকাত দেয়া ও রোযা রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকেন।”[৪৮] এখানে শুধু নামায, রোযা ও যাকাতের কথা বলা হয়েছে। তবে তার কোনো নির্দিষ্ট রূপ তখনো গড়ে উঠেনি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও তখন পর্যন্ত ফরয হয়নি, রমযানের রোযাও নির্দিষ্ট হয়নি। আর নিসাব ও পরিমাণসহ যাকাত তখনও চালু হয়নি। এসবের বিস্তারিত, সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত বিধান তো পরবর্তীতে মদিনায় অবতীর্ণ ও কার্যকর হয়। মূলত ‘ফরয যাকাত’ পর্যায়ে কথা বলার প্রশস্ত স্থান ও পরিবেশ গড়ে উঠেছিল মদিনায়। তাই এখানেই তার নিসাব, পরিমাণ ও শর্তসমূহ সবিস্তারে বর্ণিত ও বিবৃত হয়। তা আদায় করার উৎসাহদান ও দিতে অস্বীকারকারীদের ভয় প্রদর্শনও এখানেই সম্ভব ছিল।[৪৯]

সুতরাং এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, নিঃশর্ত ও পরিমাণ-অনির্ধারিত যাকাত মাক্কি পর্যায়েই ফরয হয়েছে। বহুসংখ্যক ফকিহ এবং ইমামও উক্ত মত ব্যক্ত করেছেন। কুরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদিসের ভিত্তিতেও তাই প্রমাণিত হয়। মাদানি সূরার আয়াতে ফরয যাকাতের উপর তাগিদ এসেছে, তার কোনো কোনো আইন ও বিধান বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছে। নিসাব, যাকাতের পরিমাণ ও তার সীমা-শর্ত উপস্থাপিত করেছে। এখানে অবশ্য প্রশ্ন উঠে, এসব নির্ধারণ হিজরতের পর কখন এবং কোন সালে সুসম্পন্ন হয়েছে?[৫০]

ঙ. মুফতী মুহাম্মাদ শাফী (রহ.) (১৩১৪-১৩৯৬ হি.) বলেন, ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে যাকাতের বিশেষ নিসাব বা হার নির্ধারণ করা হয়নি; বরং মুসলিমগণের নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকত তা তারা মুক্তহস্তে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদিনায় হিজরতের পর যাকাতের নিসাব ও হার নির্ধারণ করা হয় এবং মক্কা বিজয়ের পর যাকাত ও সাদাকা আদায়ের সুষ্ঠু নিয়মনীতি প্রবর্তন করা হয়।[৫১]

চ. ইউসুফ ইব্‌নুস্-সায়্যিদ যাকারিয়্যা বিন্-নূরী বলেন, পরস্পর বিরোধপূর্ণ মতসমূহের মধ্যে মীমাংসার ব্যাপারে ইসলামি বিশেষজ্ঞগণ অত্যন্ত সুন্দর ও

গ্রহণযোগ্য বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তা হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদিনায় হিজরতের পূর্বে মক্কায় যাকাত ফরয হয়েছিল; কিন্তু সে সময় যাকাতের বিস্তারিত নিসাব ও পদ্ধতি নির্ধারিত ছিল না। সুতরাং সে সময় যাকাত আদায়ের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদাহরণও দেখা যায় না।[৫২]

মোটকথা, আল-কুরআনের মাক্কি এবং মাদানি উভয় সূরাসমূহেই যাকাতের উল্লেখ লক্ষণীয়। তবে মক্কায় যাকাত ছিল নিঃশর্ত, নিসাব ও পরিমাণ অনির্ধারিত। আর তা আদায় করা মুমিন ভাইদের প্রতি ভ্রাতৃত্বের কর্তব্যবোধের উপর ন্যস্ত ছিল। তখন সম্পদ থেকে কিছু একটা পরিমাণ দিয়ে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। পক্ষান্তরে যাকাতের বিস্তারিত, সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত বিধান পরবর্তীতে মদিনায় অবতীর্ণ ও কার্যকর হয়। কেননা এখানেই যাকাতের বিধান প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। তাই এখানেই যাকাতের নিসাব, পরিমাণ ও শর্তসমূহ সবিস্তারে অবতীর্ণ হয়।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে যাকাত প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে যেকোনো কালে যেকোনো সমাজে যেকোনো ধরনের কলা-কৌশল অবলম্বিত হোক না কেন, তা সাধারণ মানুষের দারিদ্র সমস্যার সমাধানে কখনোই সফল হতে পারবে না। বিশেষ করে মুসলিম জনগণের দারিদ্র সমস্যার কোনো সমাধানই আজ পর্যন্ত অন্য কোনো আদর্শ বা প্রক্রিয়া দ্বারা করা সম্ভব হয়নি। পুঁজিবাদী অর্থনীতি অনুসরণ করেও নয়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেও নয়। বর্তমান অর্থনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় সম্পদে অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকেই এ সমস্যার Panacea ‘সর্বরোগ নিবারক’ বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক ও ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনগুলো নীতিগত ও বাস্তবতার দৃষ্টিতে দারিদ্র সমস্যার সমাধানের জন্য বিস্তারিত আলোচনা করে অধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মকৌশল গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থাপন করেছে। কিন্তু তার সবগুলোই ব্যর্থ ও অর্থহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বস্তুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জনগণকে খুব সামান্য উপকারই দিতে পেরেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তার ফলে গড়পড়তা হিসেবে মাথাপিছু আয় ক্রমশ যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা অস্বীকার করা হচ্ছে না। বিগত দশ বছরে তা শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেই সাথে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার পার্থক্য পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত মতের লোকেরা তা স্বীকার না করলেও তা এক বাস্তব সত্য। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও তার বিপুল মুনাফা সত্ত্বেও আয়ের ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টনের

(Balanced distribution of wealth) ব্যাপারে কোনো অবদানই রাখতে পারেনি। বরং সত্য কথা হচ্ছে, এসবের ফল বিপরীত হয়েছে। এতে বিরাট জাতীয় আয় খুবই অল্পসংখ্যক লোকের মুষ্ঠির মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে।[৫৩]

এ ধরনের প্রবৃদ্ধি দারিদ্র সমস্যাকে আরও জটিল ও দুঃসাধ্য করে তুলেছে। কেননা যে সব ব্যবস্থাপনা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সৃষ্টি করে, তাই অর্থনৈতিক এককেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি করে এবং সাধারণ মানুষের দারিদ্র ও আর্থিক চরম দুরবস্থাকে সুদৃঢ় করে ললাট লিখন বানিয়ে দেয়। এ কথা অর্থনীতিবিদদের ভালো করেই জানা আছে। তাই এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না যে, জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে দারিদ্র সমস্যর সমাধানের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। দারিদ্র সমস্যার কোনো সমাধানই এসব উপায়ে কোনোদিনই লাভ করা সম্ভব নয়। সেজন্য ভিন্নতর পন্থা উদ্ভাবন বা গ্রহণ একান্তই অপরিহার্য।

দারিদ্র সমস্যার সমাধানে আরও যে সকল উপায় অবলম্বিত হয়েছে তার মধ্যে G.N.P. Maximization ও এর ফলে employment বৃদ্ধিকরণ, বেশি বেশি ঋণ বিতরণ, ভোগ্যপণের মূল্য হ্রাসকরণ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কৃষি জমি ও শিল্প কারখানা দরিদ্র শ্রেণির নিকট হস্তান্তরকরণ ইত্যাদি। কিন্তু এর কোনো একটিও কার্যত সফল হয়নি। এ বিবেচনায় যাকাতই হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যবস্থা। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র দু'টি প্রান্তিক পর্যায়ের শোষণ ও বঞ্চনামূলক অর্থব্যবস্থার মাঝখানে ইসলাম মধ্যমপন্থি ও বাস্তববাদী সমাধান উপস্থাপন করেছে। ইসলাম উদ্বৃত্ত অর্থ ও সম্পদের অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই যাকাত ধার্য করেছে। তা ফরয এবং একান্তই বাধ্যতামূলক। দারিদ্র সমস্যার সমাধানে যাকাতের ভূমিকা অত্যন্ত বিস্ময়কর। এরই ফলে উদ্বৃত্ত সম্পদের একটা বিরাট অংশ প্রতি বছর নিয়মিতভাবে সরাসরি দরিদ্রদের হাতে চলে যায়। এর মাধ্যমে দরিদ্র অক্ষম অভাবগ্রস্ত লোকদের পূর্ণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা করা যায়। সেই সাথে তাদের জীবনমান উন্নীত করা এবং সর্বপ্রকার শোষণ থেকে তাদের মুক্ত করাও সম্ভব। এর ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষি ও শিল্পে নতুন জীবনের সঞ্চার হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়। আর সাধারণ জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্পে নিত্য-নতুন তৎপরতাই তো কাম্য হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যয়ের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সুদভিত্তিক ঋণ দেয়ার কোনো প্রয়োজনই থাকবে না; বরং ঋণগ্রস্ত লোকেরা যাকাতের অংশ পেয়ে ঋণ ফেরত দিতে সক্ষম হবে। অতঃপর এ অর্থ শিল্প বা কৃষির উৎপাদন ও উন্নয়নে মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে।[৫৪]

যাকাত হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি পরীক্ষিত ইসলামি ধারণা। যাকাতের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপক উন্নতি সাধিত হতে পারে। যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হলো, সহায়তার মনোভাব পোষণ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও মানুষের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করা। যাকাতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমাজের জন্য এটি খুবই কল্যাণকর একটি ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সংরক্ষণে যাকাত ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম সম্পদের লাগামহীন সঞ্চয়কে নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আবার হালাল-হারামের শর্ত, বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর করে যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি সুবিচার ও ভারসাম্যমূলক অর্থনীতি উপহার দিয়েছে। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংযত পদ্ধতি এ নির্দেশ প্রদান করে যে, ধন-সম্পদ জমা ও সঞ্চয় করার জন্য নয়; বরং একে বণ্টন করতে হবে এবং এক হাত থেকে অপর হাতে চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে মানুষের মধ্যে সম্পদের ভারসাম্য অক্ষুণ্ন থাকবে। আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন হলো 'যাকাতের বিধান'। এজন্য যাকাতের বিধানকে ফরয করা হয়েছে।

ইসলাম সীমিত পর্যায়ে ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে নিলেও এ সুযোগে যাতে অশুভ পুঁজিতন্ত্রের সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। এজন্য সম্পদশালী ব্যক্তিদের থেকে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য অভাবী মানুষের প্রয়োজন এবং সামাজিক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ঐ সঞ্চিত সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালে জমা প্রদানের দাবি জানায়। এ দাবি ঐচ্ছিক পর্যায়ের নয়; বরং আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক এবং ধর্মীয়ভাবে অবশ্যই পালনীয় ফরযরূপে অবধারিত। সুতরাং কেউ যদি তা আদায় না করে, তবে তার জন্য আইনগত শাস্তির পাশাপাশি পরকালীন কঠিন আযাবের ব্যাপারেও সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

"আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং সেগুলো আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। কিয়ামতের দিন সেগুলো জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং সেগুলো দ্বারা তাদের মুখমণ্ডল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। আর বলা হবে এগুলোই সেই সম্পদ যা তোমরা

(যাকাত না দিয়ে) পুঞ্জিভূত করে রেখেছিলে। সুতরাং এক্ষণে জমা করে রাখার স্বাদ গ্রহণ করো।”[৫৫]

যাকাত আদায়ের পর তা কুরআন মাজিদের আয়াত অনুযায়ী নির্দিষ্ট আটটি খাতের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

“যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য, এই হলো আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”[৫৬]

যাকাতকে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত খাতসমূহে বণ্টন করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'টি। প্রথমত. যাকাতদাতার মন-মানস ও ধন-সম্পদ পবিত্র ও পরিশুদ্ধকরণ। যাকাত না দিলে তা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয় না। সূরা তাওবার ১০৩ নং আয়াতে সেই কথারই ঘোষণা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত. সমাজের অক্ষম ও অভাবগ্রস্ত লোকদের সচ্ছলতা বিধান অর্থাৎ তাদের অভাব দূরীকরণ।[৫৭]

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় লোককে বিশেষভাবে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তাদের প্রতি নিয়ামত স্বরূপ এবং কিছু লোককে তা দেননি। এ নিয়ামতপ্রাপ্ত লোকদের কৃতজ্ঞতা আদায় স্বরূপ পন্থা নির্ধারণ করেছেন সে নিয়ামতের অংশ বের করে দেয়া বা তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবে দিবে সেই লোকদের, যাদের ধন-সম্পদ নেই। তাদের এ প্রতিনিধিত্ব হবে সেই কাজে, যা আল্লাহ্ তা'আলা নিজের দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করেছেন,

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

“আর পৃথিবীতে কোনো বিচরণশীল প্রাণী নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিয়েছেন তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে।”[৫৮] এ কথার মাধ্যমে।[৫৯] অর্থাৎ রিযিক তো সবাই পাবে। তবে তা পৌঁছানোর পন্থা হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা দু'টি প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছেন। একটি হচ্ছে সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া নিয়ামত হিসেবে। আর অন্যটি হচ্ছে, এ নিয়ামতপ্রাপ্ত লোকদের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে রিযিক পৌঁছানোর কাজ করবে। ফলে সমাজে ধনী-গরীবের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকবে না। সকল মানুষই নিজেদের প্রয়োজন

পাওয়ার দিক দিয়ে অভিন্ন ও একীভূত হয়ে যাবে। যাকাত বণ্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক ঘোষিত খাতসমূহ চিন্তা করলেই এ কথার সারমর্ম আমরা সহজেই বুঝতে পারি।[৬০]

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) (১১১৪-১১৭৬ হি.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত যাকাত বণ্টনের খাত যেমন অপরিবর্তনীয়, তেমনি রাসূল (সা.)-এর যাকাত গ্রহণের উৎস এবং পরিমাণ নির্ধারণও অপরিবর্তনীয়। রাসূল (সা.)-এর এ নির্ধারণ যদি অপরিবর্তনীয় মর্যাদার না হতো, আর সাধারণ মানুষ তাতে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেত, তাহলে অনেক কম-বেশি সৃষ্টি হওয়ার কঠিন আশঙ্কা থেকে যেত। অথচ রাসূল (সা.) যা নির্ধারণ করেছেন, তার চেয়ে কম হওয়া যেমন বাঞ্ছনীয় নয়, তেমনি বেশি হওয়াও অবাঞ্ছনীয়। কম হলে যাকাতের মূল লক্ষ্য কার্পণ্য প্রবৃত্তির সংশোধন ব্যাহত হতো। আর তার চেয়ে বেশি হলে তা আদায় করাই কঠিন হয়ে যেত।[৬১]

কুরআন মাজিদে ঘোষিত যাকাতের খাতসমূহের সর্বপ্রথম দু'টি খাত হচ্ছে ফকির ও মিসকিন। রাসূল (সা.) ও আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক খাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফকির-মিসকিনের প্রাধান্য পাওয়ার বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“নবি করীম (সা.) মু'আয (রা.)-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণ করার সময় বলেন, সেখানের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্ ব্যতিত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল– এ কথার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দিবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ্ তাদের উপর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথাও মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পদের উপর সাদাকা (যাকাত) ফরয করেছেন। তাদের মধ্যকার (নিসাব পরিমাণ) সম্পদশালীদের নিকট থেকে (যাকাত) আদায় করে তাদের দরিদ্রদের[৬২] মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হবে।”[৬৩]

দরিদ্রদের এ যাকাত প্রাপ্তি ধনী লোকদের অনুগ্রহ বা দয়ার দান নয়। তা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত হক। তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন,

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

"আর তাদের ধন-সম্পদে যাচনাকারী ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।"[৬৪]

তাদের ধন-সম্পদ বলে মুত্তাকি লোকদের ধন-সম্পদের কথা বুঝানো হয়েছে। যারা কেবল নিজেদের উপরই নয়, বরং নিজেদের ধন-সম্পদের উপরও আল্লাহ্ তা'আলার হক রয়েছে বলে মেনে নিয়েছে। আর এ হক নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে নিঃস্ব-দরিদ্রদের জন্য। তারা দু'পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথমত. যারা দরিদ্র হওয়ার কারণে সাহায্য প্রার্থনা করতে প্রস্তুত। দ্বিতীয়ত. যারা দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও সাহায্য প্রার্থনা করতে রাজি হয় না। উভয় শ্রেণির লোকদের জন্য হক নির্দিষ্ট হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলারই দেয়া ধনীদের ধন-সম্পদে। এ হক অস্বীকার করার অধিকার যেমন কারো নেই, তেমনি এ হক দিয়ে কারো প্রতি দয়া-অনুগ্রহ দেখানোর অধিকারও কারো নেই। এটা পাওনাদারের প্রাপ্য দিয়ে দেয়া মাত্র। আর তা যেহেতু রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালের মাধ্যমে দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টিত হবে, তাই তা ব্যক্তিগতভাবে কারো প্রতি কারোর অনুগ্রহ বলেও বিবেচিত হবে না।

আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবি করিম (সা.) বলেছেন,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

"ধনী ও সুঠাম দেহের অধিকারী কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য যাকাত হালাল নয়।"[৬৫] ফলে নিতান্তই নিঃস্ব ও দরিদ্র লোকদের ছাড়া অন্য কারো পক্ষে যাকাতের অংশ পাওয়ার সুযোগ নেই। অনুরূপ কর্মক্ষম সুস্থ দেহসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে যাকাত গ্রহণ করে বেকার নিষ্কর্মা হয়ে বসে জীবন কাটানোর কোনো সুযোগ থাকতে পারে না।[৬৬]

সুতরাং যাকাত খাতে অর্জিত আয় রাষ্ট্রের ইচ্ছামতো ব্যয় করার কোনো অধিকার রাষ্ট্রের নেই। মুসলিম সমাজ থেকে দারিদ্র দূর করার লক্ষ্যে অসহায় ও গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করার জন্য ধর্মীয় বিধানের আওতায় এটি মূলত একটি সামাজিক আত্ম-সহায়তামূলক পদক্ষেপ। আধুনিক যুগে বিভিন্ন অনুদানের মাধ্যমে বেকারত্ব, দুর্ঘটনা, বার্ধক্য ও স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য নিজস্ব অর্থায়নের যে ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে, যাকাত তার কোনো বিকল্প নয়। তাই এরূপ সকল ব্যবস্থাকেই অব্যাহত রাখতে হবে। তাছাড়া যাকাত অবশ্যই সরকারের ত্রাণ ও কল্যাণ খাতের বাজেট বরাদ্দতে কমিয়ে দেয় না কিংবা আয় পুনর্বণ্টন, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজস্ব নীতি-কৌশল প্রণয়নের দায় থেকেও ইসলামি রাষ্ট্রকে অব্যাহতি প্রদান করে না। এজন্য যাকাত খাতের

আয় অপর্যাপ্ত হলে সমাজের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যান্য উপায় খুঁজে বের করা।[৬৭]

যাকাত যেন অর্থপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারে সেজন্য করণীয় হলো, যারা নিজেদের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট পরিমাণ আয়-রোজগার করতে পারে না তাদের আয়ের একটি স্থায়ী পরিপূরক হিসেবে যাকাতকে স্থান দেয়া উচিত। অন্যদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা উচিত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং সুদমুক্ত ঋণ বা অনুদানরূপে মৌলিক পুঁজি হিসেবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, যেন তারা স্বাবলম্বী হতে পারে। আবার যাকাতকে একটি পরিপূরক তহবিল হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে এভাবে যে, প্রাচুর্যের বছর যাকাত মোটেই বণ্টন করা হবে না, যাতে মন্দার বছর বণ্টনের লক্ষে তা ব্যবহার করা যায়। তবে যদিও কোনো এক বছরে যাকাত বাবদ অর্জিত সমুদয় আয় সে বছরেই ব্যয় করার প্রয়োজন না হয়, তবুও গরিব দেশসমূহে প্রাচুর্যের বছরগুলোতে উদ্বৃত্ত সঞ্চয় করার সুযোগ খুবই কম বলেই সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে। প্রাচুর্যের বছরগুলোতেও যাকাত বাবদ অর্জিত আয়ের পরিমাণ রাজস্ব খাতে ব্যবহারের জন্য উদ্বৃত্ত তৈরির কথা দূরে থাক দরিদ্রদের প্রয়োজন মেটানো ও তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার মতো এত বেশি পরিমাণ হবে না।[৬৮]

অলস সম্পদের উপর যাকাত আরোপ করার ফলে যাকাত প্রদানকারীগণ যাকাত বাবদ প্রদেয় অর্থ পুরোটা না হলেও অন্তত আংশিকভাবে পুষিয়ে নেয়ার জন্য তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হবে। ফলে স্বর্ণ ও রৌপ্য মজুদ করার প্রবণতা ও অলস অর্থের মজুদ কমে যাবে, বিনিয়োগ বাড়বে এবং তা প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এর ফলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যাকাত আরোপের ফলে যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য অপচয়মূলক ব্যয় উৎসাহিত হয় কি না কিংবা পাওনা গ্রহণ করতে আগ্রহ কমে যায় কি না? আদর্শগতভাবে যে সমাজের লক্ষ্য হচ্ছে সহজ সরল জীবনযাপন করা, যেখানে আতিশয্য ও লোক দেখানো ব্যয় নিন্দিত হয় এবং যেখানে নিজের শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর নির্ভরশীলতা একটি ধর্মীয় কর্তব্য, সেখানে এরূপ ঘটা উচিত নয়। তথাপি ইসলামি রাষ্ট্রকে সতর্ক থাকতে হবে এবং ইসলামি মূল্যবোধ মেনে চলা নিশ্চিতকরণ ও ইসলামের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষে যাকাত যেন একটি কার্যকর পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে পারে সে লক্ষে আর্থ-সামাজিক পরিবেশকে ঢেলে সাজানোর জন্য ইসলামি রাষ্ট্রকে যথাযথ ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হতে হবে।[৬৯]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, ধনী ও বিত্তশালীদের অর্থনৈতিক শোষণ ও পীড়ন থেকে দরিদ্র শ্রেণিকে রক্ষা করা এবং তাদের যথাযথ হক লাভের জন্য যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। আর এ বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে তথা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাক্কি যুগেই প্রবর্তিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত রয়েছে। যেগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মাক্কি যুগেই মুসলিমগণের উপর যাকাতের বিধান প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এ সময় যাকাতের বিস্তারিত বিধি-বিধান প্রবর্তিত হয়নি। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিজরতের পর মদিনায় যাকাতের বিস্তারিত বিধি-বিধান প্রবর্তিত ও কার্যকর হয়। মদিনাতেই যাকাতের নিসাব, পরিমাণ, শর্তসমূহ ও ব্যয়ের খাতসমূহ সবিস্তারে বর্ণিত হয়। পরবর্তীতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর যাকাতের বিধানকে বাস্তবায়ন করেন। এমনকি মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে প্রত্যেক গোত্রের জন্য যাকাত আদায়ের নিমিত্তে কর্মচারীও নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি যাকাত সংগ্রহ করার জন্য সৎ ও যোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন বলে বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত আছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ লুইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাতি ওয়াল-আদাবি ওয়াল-উলূম* (বৈরূতঃ আল-মাতবা'আতুল-কাছূলীকিয়্যাহ, ১৯শ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৩০৩; ড. মুহাম্মাহ রাওয়াস ও ড. হামিদ সাদিক, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (বৈরূতঃ দারুন্-নাফাইস, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), পৃ. ২৩৩

২ ইব্ন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল-আরব* (বৈরূতঃ দারু সাদির, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), খ. ১৪, পৃ. ৩৫৮; হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন* (বৈরূতঃ দারুল কলম, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি.), পৃ. ৩৮০-৩৮১; আশ্-শরীফ আল-জুরজানী, *আত্-তা'রীফাত* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১১৪; সম্পাদনা পরিষদ, *আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১০৮৭

৩ Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of islam* (New Delhi: Rupa & Co, 3rd Impression, 1993), p. 699

৪ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: Spoken Language Services, Inc, Third Edition, 1976), p. 379

৫ আল-কুরআন, ৮৭ : ১৪

৬ আল-মাওয়ারদী বলেন, যাকাত-ই সাদাকা এবং সাদাকা-ই যাকাত। নাম পার্থক্যপূর্ণ হলেও যে জিনিসের নামকরণ করা হয়েছে, তা এক ও অভিন্ন। দ্র. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ফিক্হুয্-যাকাত* (বৈরূতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪০

৭ আল-কুরআন, ৯ : ১০৩

৮ আল-কুরআন, ৯ : ৫৮; এছাড়া অত্র সূরার ৬০ নং আয়াতেও (صَدَقَاتٌ) সাদাকাতুন শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে

৯ বদরুদ্দীন আল-আয়নী, *উমদাতুল কারী শারহু সহীহিল বুখারী* (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত্-তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), খ. ৮, পৃ. ২৩৩

১০ পূর্বোক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৮

১১ আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জুযায়রী, *আল-ফিক্হু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৩৬

১২ *ফিক্হুয্-যাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭-৩৮

১৩ আল-কুরআন, ২ : ৪৩

১৪ আল-কুরআন, ২১ : ৭১-৭৩

১৫ আল-কুরআন, ১৯ : ৫৪-৫৫

১৬ আল-কুরআন, ৭ : ১৫৬

১৭ আল-কুরআন, ২ : ৮৩

১৮ আল-কুরআন, ৫ : ১২

১৯ আল-কুরআন, ১৯ : ৩১

২০ আল-কুরআন, ৯৮ : ৫

২১ *ফিক্হুয্-যাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫১-৫২

২২ আল-কুরআন, ৬ : ১৩৭

২৩ *তারীখুত্-তাশরী'ইল ইসলামী*, পৃ. ৫৩-৫৪, উদ্ধৃতিঃ ডক্টর মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, অনুবাদঃ আবদুল মতীন জালালাবাদী, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৫৯

২৪ ইব্ন বাত্তাহ আল-আকবারী, *আল-ইবানাতুল কুবরা* (রিয়াদঃ দারুর রায়াহ লিন্-নাশরি ওয়াত্-তাওযী, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.), খ. ২, বাবু মা'রিফাতিল ঈমান ওয়া কায়ফা নাযালা বিহিল কুরআনু ওয়া তারতীবিল ফারাইযি ওয়া আন্নাল ঈমান কাওলুন ওয়া আমালুন, হাদিস নং ৮১৫, খ. ২, পৃ. ৬২৮

২৫ ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল-বারী শারহু সহীহিল-বুখারী* (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.), খ. ৩, পৃ. ২৬৬

২৬ পূর্বোক্ত

২৭ আহমাদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ, *সুনানুন্-নাসাঈ* (বৈরূতঃ দারুল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫-১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবু সাদাকাতিল-ফিতরি, হাদিস নং ১৮২৮, খ. ৫, পৃ. ৪৯

২৮ *ফাতহুল-বারী শারহু সহীহিল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬৬

২৯ পূর্বোক্ত

৩০ পূর্বোক্ত

৩১ পূর্বোক্ত

৩২ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল-বুখারী* (বৈরূতঃ দারু ইব্ন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), কিতাবুল ইলম, বাবু মা জাআ ফিল ইলমি ওয়া কাওলিহী তা'আলা (ওয়া কুর রাব্বি যিদনী ইলমা), হাদিস নং ৬৩, খ. ১, পৃ. ২৩

৩৩ *ফাতহুল-বারী শারহু সহীহিল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬৬

৩৪ *তারীখুত্-তাবারী*, উদ্ধৃতিঃ *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

৩৫ আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী, *আদ্-দুররুল মুখতার* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ১২৬; ইব্ন আবিদীন আদ্-দিমাশকী, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ্-দুররিল মুখতার* (বৈরূতঃ দারুল-ফিক্র, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৫৬

৩৬ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দিহলভী, *মাদারিজুন-নবুওয়াত* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২২৩

৩৭ *আল-ফিক্হু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩৬

৩৮ ড. ওয়াহবাহ ইব্ন মুস্তাফা আয্-যুহায়লী, *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু* (দিমাশকঃ দারুল-ফিক্র, ৪র্থ সংস্করণ, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ১৫৬

৩৯ *ফিক্হুয্-যাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭২

৪০ *ফাতহুল-বারী শারহু সহীহিল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬৬-২৬৭

৪১ পূর্বোক্ত

৪২ আল-কুরআন, ২৩ : ৪

৪৩ আল-কুরআন, ৬ : ১৪১

৪৪ আল-কুরআন, ৯১ : ৯

৪৫ ইব্ন কাছীর আদ্-দিমাশকী, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, তাহকীকঃ মুহাম্মাদ হুসায়ন শামসুদ্দীন (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি.), খ. ৫, পৃ. ৪০৩

৪৬ সায়্যিদ সাবিক, *ফিক্হুস-সুন্নাহ* (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩২৮

৪৭ *ফিক্হুয্-যাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬০-৬১

৪৮ *ফাতহুল-বারী শারহু সহীহিল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬৬

৪৯ *ফিক্হুয্-যাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৯-৭০

৫০ পূর্বোক্ত, খ. ১, পৃ. ৭০

৫১ মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী, অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৩

৫২ ইউসুফ ইব্নুস্-সায়্যিদ যাকারিয়্যা বিন্-নূরী, *মা'আরিফুস্-সুনান শারহু সুনানুত্-তিরমিযী* (করাচীঃ সাঈদ কোম্পানী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৫৯-১৬০

৫৩ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *যাকাত* (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৪৮-৪৯

৫৪ *যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০

৫৫ আল-কুরআন, ৯ : ৩৪-৩৫

৫৬ আল-কুরআন, ৯ : ৬০

৫৭ *যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৫৮ আল-কুরআন, ১১ : ৬

৫৯ শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন* (কায়রোঃ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ১৬৭

৬০ *যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯

৬১ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ* (বৈরূতঃ দারুল জীল, ১ম সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৬৮

৬২ উক্ত হাদিসে যাকাত ব্যয়ের খাত হিসেবে শুধু দরিদ্রদের কথা বলা হয়েছে, অথচ যাকাত ব্যয়ের খাত ৮টি। এর কারণ হলো, তখন ওরাই ছিল বেশি সংখ্যক। দ্র. *ফিক্হুয্-যাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৪

৬৩ *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু ওজূবিয্-যাকাত, হাদিস নং ১৩৯৫, খ. ২, পৃ. ১০৪

৬৪ আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

৬৫ সুলায়মান ইব্নুল আশ'আছ আস্-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ* (বৈরূতঃ দারুল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫-১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবু মান ইয়ু'তি মিনাস্-সাদাকাতি ওয়া হাদ্দুল গিনা, হাদিস নং ১৬৩৪, খ. ২, পৃ. ১১৮

৬৬ *যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১

৬৭ ড. এম ওমর চাপরা, অনুবাদঃ ড. মাহমুদ আহমদ, *ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৩৫৭

৬৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৮

৬৯ পূর্বোক্ত